বুলবুল

নজরুল ইস্‌লাম

ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রিট, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীগোপাল দাস মজুমদার।
ডি, এম্, লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৩৫।
দ্বিতীয় সংস্করণ—চৈত্র ১৩৩৫।
তৃতীয় সংস্করণ—ভাদ্র ১৩৩৭।

প্রিণ্টার—
শ্রীঅমূল্য চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
ভট্টাচার্য্য প্রেস
১২, নন্দলাল বসুর লেন,
কলিকাতা

মূল্য—১।০
রাজ সংস্করণ—১॥০

সুর-শিল্পী, বন্ধু

দিলীপ কুমার রায়

কর-কমলেষু

আমার শুধু এ বাণী হে বন্ধু, আমার শুধু এ গান।
তুমি তারে দিলে রূপ-রঙ্গিমা, তুমি তারে দিলে প্রাণ!
আমার ব্যথায় বেঁধেছিল নীড় যে গানের বুল্‌বুলি,
আপনি আসিয়া আদরে তাহারে বক্ষে লইলে তুলি'!
আমার পাখীর কণ্ঠে মিশালে তোমার দরদ ল'য়ে,
আমার বেদনা বাজে আজ তাই সবার বেদনা হ'য়ে।
যে গান গেয়েছি একাকী নিশীথে কুসুমের কাণে কাণে,
ওগো গুণী, তুমি ছড়াইলে, তারে সব বুকে, সব খানে।
বুকে বুকে আজ পেয়েছে আশয় আমার নীড়ের পাখী,
মুক্তপক্ষ উড়িতে যে চায়—কেন তারে বেঁধে রাখি?
তোমার কাননে উড়ে গেল মোর বাগিচার বুল্‌বুলি,
বড় ভীরু সে যে, দোস্ত্‌, তাহারে দস্তে লইও তুলি'!

কলিকাতা
১৫ই আশ্বিন
১৩৩৫

তোমার প্রতিভা ও প্রাণমুগ্ধ

নজরুল

উপহার

সূচী

—বিষয়—			—পৃষ্ঠা
১	অধীর অম্বরে গুরু গরজন	...	৫৫
২	আজি এ কুসুম-হার	...	৪৯
৩	আজি দোল পূর্ণিমাতে	...	৪৫
৪	আমারে চোখ ইশারায়	...	৩
৫	আসিলে এ ভাঙা ঘরে	...	৪৩
৬	আসে বসন্ত ফুলবনে	...	১৭
৭	এ আঁখি জল মোছ পিয়া	...	৩৫
৮	এত জল ও কাজল চোখে	...	১৫
৯	এ বাসি বাসরে	...	২৭
১০	এ নহে বিলাস বন্ধু	...	৮০
১১	করুণ কেন অরুণ আঁখি	...	১৩
১২	কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে	...	৭১
১৩	কি হবে জানিয়া বল	...	৩৭
১৪	কেন উচাটন মন	...	৪১
১৫	কেন কাঁদে পরাণ	...	৮
১৬	কেন দিলে এ কাঁটা	...	৩০
১৭	কেন আন ফুল-ডোর	...	৭৩
১৮	কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া	...	৭৫
১৯	কেন আসিলে	...	৭৭
২০	কে বিদেশী	...	১১
২১	কে শিব-সুন্দর	...	৬৮
২২	কোন শরতে পূর্ণিমা চাঁদ	...	৬৩
২৩	গরজে গম্ভীর	...	৫১

'বুলবুলের' কবি

শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত

ফরাসী যাদুকর আনাতোল ফ্রাঁস ঘটনাটী এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—জীবনের সায়াহ্নে বিসমার্ক শহর ছাড়িয়া গ্রামে (villa-তে) আসিয়া বাস করিতেছিলেন, কর্ম্মক্লান্ত জীবনের শেষ শান্তিকে এখানেই গ্রহণ করিবেন এই আশায়। একদিন ভোরবেলা বৃদ্ধ বিসমার্ক বারান্দায় ইজিচেয়ারে একাকী বসিয়া আছেন। সম্মুখে শ্যাম বনানী, বনের গাছে গাছে তখন কচি পল্লবে সবুজের বান ডাকিয়াছে—বনে বসন্ত আসিয়া পড়িয়াছিল। ভোরের আলো বনের মাথায় মাথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে—দুইচোখ মেলিয়া তিনি তাহাই দেখিতেছিলেন। ধীরে ধীরে চোখের দুই কোণে দুই ফোঁটা অশ্রু জমিয়া উঠিল। বৃদ্ধ বিসমার্ক বলিয়া উঠিলেন—"হায়, আমার জন্য—শুধু আমারই জন্য ইউরোপের তিন তিনটা যুদ্ধ হল।" স্বর ভাঙ্গিয়া পড়িল, আর্ত্তস্বরে বৃদ্ধ কাঁদিয়া উঠিলেন—"এত অফুরন্ত জীবন আমার গ্রামের, এই বনখানিতে সঞ্চিত রয়েছে, আর আমি হতভাগা, এমনি করে জীবন থেকে বঞ্চিত হলাম। Oh, I have lost my life!"

জীবনের শেষদিনে আমি আমার জীবন হারাইয়াছি,—হায়, আমি জীবন হারাইয়াছি—এই বলিয়া বিসমার্ক যে দুইফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তার মাঝে তাঁর সমস্ত অগণিত কীর্ত্তি তুচ্ছ হইয়া ডুবিয়া গিয়াছে। দুই ফোঁটা অশ্রুর কাছে বিসমার্কের বাকী সমস্তটা জীবন হার মানিল। বিসমার্ক শেষ হইয়াছেন—তাঁর কর্ম্মকীর্ত্তি ধূলায় ধূসর

হইয়াছে—কালের চাকার নিষ্পেষণ সহিবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। কিন্তু এই দুই ফোঁটা চোখের জলের সাথে পরমাণু নিয়া মহাকালের লড়াই চলিল—চোখের জলের কাছে মহাকালই একদিন ক্লান্তিতে হাঁটু গাড়িয়া হার মানিবে। অনন্তকালের চোখে এই দুই ফোঁটা জল অশ্রু হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিসমার্ক চোখের দুই ফোঁটা জলে মহাকালকে ভুলাইয়াছেন—আজ চোখের জল অমর হইয়া রহিল। চিরন্তন ক্রন্দসীর ক্রন্দনের অশ্রুমালার এই দুই ফোঁটা জল ফুল হইয়া দুলিয়া রহিল। এমনই হয়—

কাজী নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া আনাতোলের এই কথা কেন মনে হইল—তাহাই বলি। নজরুল 'বিদ্রোহী' কবি বলিয়াই পরিচিত। 'বিদ্রোহী'র কবি তিনি—কাজেই তাঁর সৃষ্টি তাঁর বিশেষণ হইয়া তাঁর নামের সঙ্গে আসিয়াছে। সৃষ্টি দিয়াই সৃষ্টিকর্ত্তাকে চিনি। এবং সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্টি উভয়কেই আমরা এক সঙ্গে এমনই করিয়া স্মরণ করি। নজরুলকে 'বিদ্রোহী'র কবি না বলিয়া 'বিদ্রোহী' কবি বলাই উচিৎ কি না সে প্রশ্ন এখানে তুলিতে চাহি না; আমার বক্তব্য স্বতন্ত্র।

'বিদ্রোহীতে' বিসমার্কের মতই কবি আপন শক্তির নেশায় একদিন মশ্‌গুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিজের সীমা খুঁজিতে গিয়া বিদ্রোহী অবশেষে ঘোষণা করিয়াছেন,—"আমার সমুন্নত শির সৃষ্টির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া সৃষ্টির বাহিরে বহু বহু উর্দ্ধে সীমা হারাইয়া ফেলিয়াছে—যেখানে অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই—এতদূরে।"

সৃষ্টিকে ধ্বংস করিয়া যে বিধাতার মাথা ডিঙ্গাইয়া গেল, সে বিদ্রোহী, কিন্তু তবু মানুষের কাছে বড় হইতে পারিল না। কারণ মানুষ জানে যে, এই বিপুল কীর্ত্তির পরমায়ু মহাকালের পলকের ফুৎকারে নিভিয়া যাইবে, অনন্ত দিনের ঝড়-ঝঞ্চা সহিবার মত

ক্ষমতা বিদ্রোহীর সমুন্নত কীর্ত্তিস্তম্ভের নাই। বিধাতার সৃষ্টিকে ধ্বংস করিয়া বিধাতার সঙ্গে লড়াই করা চলে, কিন্তু মহাকালের দরবারে তাতে বিন্দুমাত্র বিক্ষোভ ওঠে না। তাই বিদ্রোহীকে বিস্ময়ের চোখেই দেখা যায়, ভয় ও শ্রদ্ধাও যে একটা না থাকে এমন নয়। কিন্তু ভালবাসার মাঝে যে শুচিস্নান না করিয়া আসে সে ত অমর হইতে পারে না।

বিসমার্কের অমর কীর্ত্তি দুই ফোঁটা চোখের জল যেমন তাঁর জীবনের শেষ দিনের প্রতীক্ষায় ছিল, তেমনি কিছু একটা বিদ্রোহীর বিদ্রোহেও যেন চুপ করিয়া ছিল। 'মম একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী' এই কথায় তাহার পূর্ব্বাভাষ আছে, কিন্তু সম্যক প্রকাশ নাই, কারণ আর এক হাতের রণতূর্য্যই তখন ভীষণ গুরুগর্জ্জনে বাজিয়া উঠিতেছিল।

বাঁশী নীরব হইয়াই ছিল, কিন্তু বিদ্রোহীর অশান্ত তূর্য্যের ভৈরব গর্জ্জন বাঁশীর বুকের কবরচাপা ঘুমন্ত সুরে মাঝে মাঝে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে—যেমন আকাশের গুরু গুরু মেঘগর্জ্জন নিশীথ-নীপ-শাখায় ঘুমন্ত শিখীর কণ্ঠে আচমকা প্রতিধ্বনি তোলে—তেমনি। তাই ত বিদ্রোহীর হাঁকদরী হাঁকের এক প্রান্তে একটি করুণ অশ্রুমুখী সুরধ্বনিকে দেখিতে পাই, শুনি—

আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি
ছল ক'রে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালবাসা তার
কাঁকন চুড়ির কন কন।

তখনই মন বলে, বিদ্রোহীর রণতূর্য্যে তোমার সত্যিকার পরিচয়

নয়। দেশের, সমাজের জন্য তোমার এই বিদ্রোহের হয় ত অনেক খানিই প্রয়োজন আছে, যেমন আগ্রার দুর্গের একদিন প্রয়োজন ছিল, মোগল-সাম্রাজ্যের খবরদারী করিবার। কিন্তু মহাকালের কাছে তাহা অকিঞ্চিৎকর, তার প্রচণ্ড চরণপাতে আগ্রার বিশাল দুর্গের মতই বিদ্রোহী তুমি একদিন ধূলায় রেণু রেণু হইয়া ছড়াইয়া লুপ্ত হইয়া যাইবে। তোমার বাঁশী আছে তার প্রয়োজন নাই সত্য, যেমন তাজমহলের প্রয়োজন নাই, কিন্তু সেই বাঁশীতে যে সুর লুকাইয়া রাখিয়াছ তাহাকে মুক্ত কর, সে সুরের তালে তালে মহাকাল তার প্রেয়সীর জন্য কান্নার গানখানি গাহিবে। বাঁশীই তোমাকে বিসমার্কের চোখের জলের মত অমর করিবে, তোমাকে তখনই আমরা বড় বলিয়া স্বীকার করিব, যখন তুমি বিদ্রোহের সু-উচ্চ সুর নমিত করিয়া কাঁদিয়া বলিবে—"ওই এক ফোঁটা শিশু-পল্লবে অনন্ত জীবন সঞ্চিত রয়েছে, ওগো তৃষ্ণাতুর মানব, তুমি তাকে বন্দী কর, তাকে উপেক্ষা করো না; তবে জীবন হারাবে —বঞ্চিত হবে এ জীবনে।" তখন আমরাও বলিব—"ওগো কবি, তোমার কণ্ঠে যে সুর বাজে, মহাকালের বীণায় তার অনন্ত প্রতিধ্বনি ওঠে।"

বিশ্বের এই বিচিত্র গন্ধ-বর্ণের অবগুণ্ঠন টানিয়া যে চিরন্তন ক্রন্দসী আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে তাহাকে আবিষ্কার করাই কবির কাজ। নিখিলের এই প্রকাশের যবনিকা উত্তোলন করিলে দেখা যায় যে, এই রূপ-রস-গন্ধের অন্তরালে একটা চিরন্তন কান্নার ফল্গুধারা অনন্তকাল প্রচ্ছন্ন হইয়া বহিতেছে। শ্রেষ্ঠ যে কবি, সে এই অবগুণ্ঠন মুহুর্মুহুঃ উন্মোচন করিতে প্রয়াস পায়—এই সৃষ্টির আড়ালে যে রহিয়াছে, তাহাকে সৃষ্টির সামনে প্রকাশিত করে। কবিহিসাবে কাজি নজরুল এ-দিক দিয়া কতখানি সার্থক হইয়াছেন, তাহাই বিচার করিব।

কথাটা অবান্তর হইলেও না বলিয়া পারিলাম না। একাধারে এমন লাঞ্ছিত ও সমাদৃত, নজরুলের মত আধুনিক কবিদের মধ্যে অল্পই আছে। কবির কণ্ঠে কুসুমের মালার পরিবর্ত্তে নজরুলের ভাগ্যদোষে তাহা কণ্টকেই ভরিয়া আছে, এই কণ্টকমালার প্রতি কণ্টকমুখে যে জ্বালা বিস্ফুরিত হয়, তাহার দাহে হয় মানুষ মরে, নয় গরলপায়ী নীলকণ্ঠের মতই অমর হয়। বিধাতা তার সুখ-দুঃখের চাকা মানুষের অদৃষ্টের পথে পর্য্যায়ক্রমে ঘুরাইয়া নিয়া ফিরিতেছে—যেমন আকাশপথে দিবস-রাত্রি একের পর অপরে পালা করিয়া ঘুরিয়া মরে। দুঃখের চাকা শেষ পাক খাইয়া যখন অদৃশ্য হইবে, সেদিন যে কবির কণ্ঠের কণ্টক-মালার প্রতিটি কাঁটা গোলাপ হইয়া পলকে ফুটিয়া উঠিবে—এ ত মিথ্যা দুরাশা নয়।

কবি নজরুলের লেখায় ফিলজফি নাই—একটা নালিশ তাঁর সম্বন্ধে শোনা যায়। এ অভিযোগ সত্যি হইলে দুঃখ নাই—মিথ্যা হইলে ত কথাই থাকে না। তবু কথাটা না থাকাই উচিত। যাহা কবির লেখায় নাই তাহার জন্য তাঁহাকে অপরাধী করিয়া বড়জোর গালমন্দ দেওয়া যায়, নিন্দা করা যায়; কিন্তু কবিকে চেনা যায় না। যাহা তাঁহার আছে, তাহা দিয়াই তাঁহাকে চিনিতে হইবে। মরুভূমির কাছে জল চাহিলে সে মরীচিকার ছলনাই করে—পিপাসা মিটায় না। নজরুল কবি, ফিলজফি চাহিলে চলিবে কেন? তাঁর কাছে যাহা চাহিতে হয় তাহা নিয়াই সমালোচনা ত করিতে হইবে।

নজরুলের প্রতি রক্তবিন্দুটি ভালবাসায় রক্তরঙীন। ভালবাসা নিয়া তিনি দর্শনশাস্ত্র রচনা করেন নাই, ব্যথার গানই গাহিয়াছেন। রাম-গিরির বিরহী যক্ষ ইচ্ছা করিলে আষাঢ়ের প্রথম মেঘমালার কাছে বিরহের একটা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রূপ বর্ণনা করিতে পারিতেন, কিন্তু

মেঘের হাতে তাঁর অন্তর-ব্যথা সমর্পণ করিতে পারিতেন না। আজও প্রতি বর্ষ মেঘদূতের হাতে সেই আদিম বিরহীর বিরহলিপি দেখিয়া এত দিন পরেও সভ্যজগতের সুখী মানবও বিমনা হয়। যাক—যাহা বলিতেছিলাম।

নজরুল প্রেমিক কবি। এই ধুলোমাটির তুচ্ছ মানুষের প্রেমই তাঁর সম্পদ। তাঁর সমস্ত কবিতা রক্ত-মাংসের মানুষের ব্যথায় ও কামনায় ভরপুর। যে ব্যথা সে পায় নাই - সেই অরূপ ব্যথার গান বিনাইয়া বিনাইয়া সে গাহে নাই। নিত্যকার মানুষ যে ব্যথা পায়—কাঁদিয়া আকুল হয়—তাহারই ব্যথায় সিন্ধু মথিত করিয়া কবির কাব্য জন্ম নিয়াছে।

সর্ব্বশেষে তাহাই বলি প্রথমেই যে কথা বলা উচিত ছিল নজরুলের লেখার সমালোচনা-প্রসঙ্গে। নজরুল যৌবনের কবি। যৌবনের যে দিকটা ক্ষ্যাপা রুদ্রের মতই ধ্বংস-মাতাল, সেদিকের সাথে কবিকে আমরা যে ডমরু বাজাইতে শুনিয়াছি তাহা অতুলনীয়। দেশের অধীনতা ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান আজ বাঙলা সাহিত্যের গর্ব্বের সামগ্রী।

যৌবনের অপর দিক—যেদিকে যৌবনের প্রতিপাদক্ষেপে, সৃজনের নব নব শতদল রূপের শঙ্খে অসংখ্য জয়ধ্বনি তুলিয়া সারি বাঁধিয়া ফুটিয়া ওঠে, সে দিকের কথা বলিতে গিয়া প্রথমেই মনে পড়ে বিদ্রোহীর আত্ম-সমর্পণ—

হে মোর রাণী, তোমার কাছে
হার মানি আজ শেষে।

বিদ্রোহী শান্ত হইয়াছে, তার রাণীর কাছে নত হইয়া পরাজয় ভিক্ষা মাগিতেছে। পদতলে নত যৌবন অঙ্গুলি ইঙ্গিতে দেখাইতেছে 'এই

সমরজয়ী অমর তরবারী' এই ক্লান্ত মুঠিতে শিথিল হইয়া আসিয়াছে, ওই দেখ বিদ্রোহীর রক্তরথের চূড়ায় তোমার নীলাম্বরী পতাকা হইয়া দুলিতেছে। আমি হার মানি ওগো রাণী আমি হার মানি। বিদ্রোহী, যৌবনের এই পরাজয়, এই হারমানাই তোমার গলার হার হোক।

এই হারমানার সাথে রবীন্দ্রনাথের "আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর" কবিতার পরম মিল আছে। সেখানেও যুদ্ধঅস্ত্র ধনুঃশর ফেলিয়া ভূতলে রাণীর রক্তপদতলে প্রেমিক ভিক্ষা মাগিতেছে—আমি যে মালঞ্চের হব মালাকর, আমি তব স্বেচ্ছাবন্দী দাস।

এই 'শ্যামলা বিপুলা ধরণীর পানে' চাহিয়া কবি মুগ্ধ মনে যে গান গাহিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। এই গন্ধ-বরণের যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া সে চিরন্তন প্রেয়সী ডাকে—এ হারমানি, তারই জওয়াব।

কবির গানখানি কহিবার আগে আইরিশ কবি ইয়েট্সের একটা গ্রাম্য কবিতা মনে পড়িল। মাঠের পথে গ্রাম্য বালা একা গাহিয়া চলিয়াছে—ওগো আমার প্রিয়, আমি ত দিকে দিকে আমার সন্ধান-সঙ্কেত ছড়াইয়া রাখিয়াছি, তবু তুমি আমার কাছে আসিতে পারিলে না, সে কি আমার অপরাধ? বসন্তের বনভূমিকে জিজ্ঞাসা কর, সে আমার সন্ধান জানে; হেমন্তের গোধূলি-বেলায় আমার সোনার লিখন-পথের সঙ্কেত কহে; বর্ষাদিগন্তের শ্রাবণ-রেখায় দিগবধূ আমারই দেশের পথ দেখায়; ধরণীর তৃণে তৃণে আমার সোনার পুরীর অভিমুখে গোপন পথ পড়িয়াছে—তুমি যদি তাহা না জান, সে কি আমার অপরাধ প্রিয়, সে কি আমার অপরাধ! এই হইল আইরিশ-কবির সে কবিতার মূল সুর।

নজরুলের গানখানি এই—

আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী ?
খুলে দাও রংমহলার তিমির দুয়ার ডাকিলে যদি ।

যদি ডাকিলে, তবে নিখিলরাণী, তোমার এই বিচিত্র রূপরঙীন তিমির দুয়ার খোল, খোল, রাণী, তোমার দুয়ার খোল। শুনিয়াই রবীন্দ্রনাথের সে কথা মনে পড়ে—"কে দিয়াছে হেন শাপ হেন ব্যবধান। কেন কাঁদে ঊর্দ্ধে চেয়ে ব্যর্থ মনোরথ।" আরও মনে পড়ে রাধিকাকে ক্রোড়ে লইয়া বিরহভীতু কৃষ্ণের কান্না। সেখানেও প্রশ্ন—"কে দিয়াছে হেন শাপ হেন ব্যবধান।"

কবি কাঁদিয়া চলিয়াছে, গুলবাগিচায় চৈতী হাওয়ায় তোমার লিপি পাঠাইয়াছ—সে খবর কহিতে গিয়া কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া চোখদুটি লাল করঞ্জা করিয়া ফেলিল। ও গো আমার দরদী !

পাঠালে ঘূর্ণীদূতী ঝড়-কপোতী বৈশাখে সখি,
বরষায় সেই ভরসায় মোর পানে চায় জলভরা নদী।

"বরষায় মোর পানে চায় জলভরা নদী"—একটি সুরের টানে কবি অনন্ত দিনের বিরহিণীর যে ছলছল আঁখির ছবি আঁকিয়াছে, এর তুলনা নাই ; এ অনবদ্য—অপূর্ব্ব।

কবির গান চলে—

পউষের শূন্য মাঠে একলা বাটে চাও বিরহিণী,
দুহুঁ হায় চাই বিষাদে মধ্যে কাঁদে তৃষ্ণা জলধি।

তোমার আর আমার মাঝে বহিয়া চলিয়াছে হায়, কোন্ অজানা অভিশাপের মত এই তৃষ্ণার জলধি। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা—

মিলনের পাত্রটি পূর্ণ যে বিচ্ছেদে বেদনায় ;

এই চিরন্তন তৃষ্ণাজলধির ব্যবধান—এই দুস্তর বিরহ কেমন করিয়া পার হই—তখনই মানবাত্মা কাঁদিয়া আকুল হইয়া লুটাইয়া পড়ে—"ওগো, দুহুঁ হায় চাই বিষাদে মধ্যে কাঁদে তৃষ্ণা জলধি।" এই গানের ছোঁয়া লাগিয়া বুকের মাঝে যেন কেমন একটা ব্যথা তিব্ তিব্ করিয়া কণ্ঠ পর্য্যন্ত ফেনাইয়া ওঠে; যাকে পাই নাই কোন দিন, যাকে হারাই নাই কখনও—তার জন্যই কেমন একটু অবুঝ ব্যথা এমনই সত্য হইয়া উঠে যে, উর্দ্ধের তিমির আকাশে দেখি অন্ধকার কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, দেখি—

তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার সঙ্গ সুধারস।
—রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু কবি আশ্বাস শুনায়—

ওরে মন, এই ভোরের মলয়ার সাথে বলয় বন্ধন হউক তোমার, এই তিমির দুয়ার চিরবন্ধ রহিবে আর কতকাল?

মানুষ, রক্তমাংসে সে সীমাবদ্ধ মানুষ—এই বোধ যখন তার হয় তখন সে আবিষ্কার করে যে, বিশ্বের এই অস্তিত্বের পিছনে একটা মর্মান্তিক ব্যথার নদী চিরবহমান—সে ধারা নিয়তির মতই অমোঘ—দুর্ব্বার নিষ্ঠুর। সে নদীর ছলছল গানের সাথেই সব কবি তার রাখিয়া তাদের বীণার তার বাঁধে। কাজি নজরুল সে ব্যথা-বারিধির অনন্ত কলধ্বনিকে বুক ভরিয়া আনিয়াছে।

সব কবিরই এই ব্যথাই মূলধন। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যথার আঘাতে কাঁদিয়া ধাবমান বলাকার পলাতক পাখার স্পন্দনে আকুল হইয়া কাহলেন—

হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা আর কোন খানে।

এই ব্যথার সাধনায় রবীন্দ্রনাথ ঋষির মতই সত্যদ্রষ্টা হইয়াছেন

পৃথিবীকে এক ক্ষণভঙ্গুর মাটির ভাণ্ড হইতে ঊর্দ্ধে—বহু ঊর্দ্ধে অমৃতের সন্ধানে চোখ ফিরাইতে কহিয়াছেন। এ-দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বিশ্বকে বিশ্বাতীত আশ্রয়ে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন তিনি।

কিন্তু ব্যথার আঘাতে নজরুল এই চোখের জলে সিক্তসুন্দর ধরণীকে ছাড়িয়া যায় নাই। সে জানে বিরাট মৃত্যুর ভাঙনকূলে সৃষ্টির ঘর। খণ্ড পরমায়ুর আশ্রয়গুলি মুহুর্মুহুঃ তলাইয়া যাইতেছে সে দুর্ব্বার খরস্রোতে। কিন্তু যতই সে জানে যে, যাকে পাইয়াছি তাকে হারাইতে হইবে, মৃত্যুর কাল জলের ডাক ঐ শুনা যায়, ততই সে বেশী করিয়া ভাল বাসিয়াছে। এই ধূলিমাটির বেদনার বন্ধনকে আরও সবলে জড়াইয়া ধরিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যথায় উদাসীন বৈরাগীর নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার শান্তির আভাষ আছে; কিন্তু নজরুলের ব্যথায় মৃত্যুশীল মানুষের হারাইবার বেদনা, পাইয়া না রাখিতে পারার জ্বালা আছে। ব্যথা সে পাইয়াছে—ইহাই তাহার কাছে সত্য, তাই ধরণীর গাত্রে আর কোন সান্ত্বনার মিথ্যা আবরণ সে পরায় নাই।

রবীন্দ্রনাথ—'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল্' কবিতায় একটা ব্যথাতুর মানবাত্মার মুক্তি-কান্নাকে বাঁধিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই কান্নার অন্তরালে একটা বিবাগী বাউল যে আপন মনে অতি সঙ্গোপনে একতারা বাজাইয়া চলিয়াছে—তাহা যেন আভাষের মত টের পাওয়া যায়। "কবে ফুরাবে সব খেলা জানিস্ যদি বল্" শেষের মধ্যে নিজের এই ব্যথার একটা সমাপ্তি রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন—নিজকে শেষের একটা রূপহীন কায়াহীন নির্ব্বিকার শান্তির ছোঁয়া দিয়া ব্যথাকে হত্যা করিয়াছেন।

নজরুল প্রকৃতিতে রবীন্দ্রনাথ হইতে স্বতন্ত্র—একটা শেষের সন্ধান সে চাহে নাই। ব্যথা তার এত প্রবল যে শেষকে পর্য্যন্ত কামনা করিবার অবকাশ থাকে না। সে এই ব্যথামাখা প্রেমিকের চোখে পৃথিবীকে দেখিয়াছে—আর দেখিয়াই চলিয়াছে। নিম্নের সন্ধ্যার এই গান খানিতে 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল্'—সে সুরও আছে, নারীর যৌবন-জোয়ারের পানি পেলে না ফিরেগো আর, যৌবনের এই আসন্ন ভাঁটার ভীতি আছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রেমিকের বেদনা আছে। অবশ্য কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের বধূ কবিতার সাথে একই স্তরে রাখিয়া বিচার করা চলে না—কারণ দুটি দু'ধরণের কবিতা।

এই কবিতার সুর একটি নিরবচ্ছিন্ন সুর নহে। কোন্ খেয়ালী অসাবধানে বিরহ মিলনের তার দুটির সাথে বৈরাগ্যের একটু রেশ জড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছে যে, ছড় চালাইলেই একটা অপূর্ব্ব কান্না হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মোচড় খাইয়া ওঠে, কবি কহে—

বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরনে চললো গোরী।

তারপরে যে সুরটুকু আসে, তাহা যে ওই একাকিনীর ব্যথাটুকুই শুধু আনে, তা নয়, এই মূক বোবা প্রকৃতির সাথে ব্যথাতুর মানবাত্মার কথার যে কানাকানি চলে, সে খবরটুকু ও আনে। তাই শুনি—

চল জলে চল কাঁদে বনতল
ডাকে ছল ছল জললহরী।

ব্যথা এত নিবিড় হয় যে, বনতলে কান্না শুনা যায়—তার জন্য যে গাগরী কাঁখে জলকে এই পথে যাইবে। গাঁয়ের নদীটি পর্য্যন্ত আঙ্গিনার নীরব বধূটিকে বেলা শেষের সুরে ডাকে—ওগো, বেলা যে যায়, জলকে

এস। ব্যথা কত একান্ত হইলে সন্ধ্যার বনতল ও নদীতরঙ্গে তাহা বিলান চলে—তাহাই ভাবি।

তারপর কবি সন্ধ্যার যে ছবি দিয়াছে তাহা সত্যই রক্তমাংসের মানুষের ব্যথায় ও বেদনায় পুঞ্জিত। কবি 'দিবা অবসান হল' বলিয়া পূরবীর ম্লান বৈরাগ্য রাগিণী গাহে নাই। কিংবা—

ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা

বলিয়া একটা সীমাহীন মনের আবেগহীন নির্লিপ্ত মহান উদাসীনতাও প্রকাশ করে নাই।

কবি কহিল—

দিবা চলে যায় বলাকাপাখায়
বিহগের বুকে বিহগী লুকায়,
কেঁদে চখাচখী মাগিছে বিদায়
বারোয়াঁর সুরে ঝুরে বাঁশরী।

সন্ধ্যার সমস্ত ছবি কবি বাদ দিল। নির্জ্জন আঙ্গিনায় একাকিনী যে বসিয়া আছে তাকে গিয়া কহিল,—"দিবা চলিয়া যাইতেছে; সখি, 'বিহগের বুকে বিহগী লুকায়,' চখাচখী কাঁদিয়া রাত্রির মত বিদায় লইতেছে।" আর কোন কথা না কহিবার অর্থ কি? অন্য সমস্ত কথা বাদ দিয়া এই খবর দিবার মাঝেই কবির বিশেষত্ব। সন্ধ্যার ছবি ধীরে ধীরে চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে। আর সব চেয়ে বড় কথা এই, যে 'বিজনের একাকিনীকে' কেন একা চুপ করিয়া বসিয়া আছে, 'জলকে যাবে না' বলিয়া প্রশ্ন করা হইয়াছিল, সন্ধ্যায় তার অন্তর-ব্যথা এই দুইটি ছবির মাঝে ধরা দিয়াছে—'কেন' প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া হইয়াছে।

সন্ধ্যার এই ছবি চয়নে যে কৃতিত্ব কবি দেখাইয়াছে তাহা অনিন্দ্যনীয়। সেই একই মনোভাব ও রুচি ছবি সংগ্রহ করিয়া চলিয়াছে—

সাঁজ হেরে মুখ চাঁদ-মুকুরে
ছায়াপথ সিঁথি রচি চিকুরে,

রসের দিক দিয়াই যে শুধু অপূর্ব্ব তা নয়, বর্ণনার দিক দিয়াও এই কয় ছত্র সাহিত্যে অপূর্ব্ব। তার পরে পাই—

নাচে ছায়া-নটী কানন-পুরে,
দুলে লটপট লতা-কবরী।

এখানেও চিত্র-নির্ব্বাচনে প্রেমিক-মনের সেই সূক্ষ্মতার আভাষ পাই। 'ছায়া-নটী' ও 'লতা-কবরী' শব্দ দুইটির সাহায্যেই কবি বিচিত্র একটি প্রেমাতুর সন্ধ্যার ছবি চোখের সামনে ধরিয়া দিয়াছে; হয় ত দিনান্তে আঙিনার খুঁটি ধরিয়া আসন্ন অভিসারিকা রাধাও একদিন সন্ধ্যার বন-তলের পানে চাহিয়া এই দৃশ্যই দেখিয়াছিলেন।

সেই ছবি আরও প্রসারিত হয়—

'বেলা গেল বধূ' ডাকে ননদী
চল জল নিতে যাবিলো যদি,
কালো হয়ে আসে সুদূর নদী,

'বেলা গেলো বধূ' এবং 'চল জল নিতে যাবিলো যদি'—ননদীর এই ডাকে মন কোন্ স্মরণাতীত অতীতের সন্ধ্যার সামনে গিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায়, যখন সে দেখে—

নাগরিকা সাজে সাজে নগরী

শুধু ইহাই নয়। এই ননদী শব্দ এবং 'চল জল নিতে যাবিলো যদি' শব্দে গাঁয়ের শান্ত নম্র সন্ধ্যাটি চোখের উপর অনাড়ম্বর মহিমায় ফুটিয়া ওঠে; পল্লীর মুদিত দিবসের সন্ধ্যার শান্তিখানি যেন মনকে আসিয়া স্পর্শ করে। সম্মুখে অবসন্ন রজনীর অন্তরালে 'যেন ভিনগাঁর ভীরু মেয়ের' অভিসার-পদধ্বনি শুনিতে পাই।

'কালো হয়ে আসে সুদূর নদী'—এই ছত্রটির ব্যাখ্যা অসম্ভব। ইহা এমন একটি ভাবকে মনের মনে অনুভূতির মত শিহরণ তোলে যে, ভাষার আহরণে তাহাকে রূপ দিয়া বাহু বাড়াইয়া সম্মুখে আনা যায় না। অতি সুকুমার অনুভূতির ন্যায় মনের সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, যেমন শান্তনিশীথে নিস্তরঙ্গ সিন্ধুর বুকে একটা নিরবচ্ছিন্ন 'ও-ও-ও-ম' ধ্বনি কূল হইতে কূলে প্রসারিত হইতে থাকে। কালো হয়ে আসে সুদূর নদী—কম কবির কলমেই এমন অপূর্ব্ব মায়া সৃষ্টি ধরা দেয়। সৌভাগ্যের মতই ইহা কদাচিৎ আসে।

এই সন্ধ্যার গানের শেষ হইল—

কারে ভেবে বেলা কাঁদিয়া কাটে
ভর আঁখি জলে ঘটগাগরী॥

অনেক কিছু লিখবার ছিল। আমি শুধু আর দুই একটি স্থান হইতে তুলিয়া ক্ষান্ত হইব।

ব্যথিতার গান—

কেন কাঁদে পরাণ কী বেদনায় কারে কহি,
সদা কাঁপে ভীরু হিয়া রহি রহি॥

যাকে চাই, তার জন্য ব্যথা ও কামনাকে কেমন করিয়া বাহিরের বিশ্ব আমাদের বুক হইতে লুণ্ঠন করিয়া লয় তাহা দেখিবার বস্তু বটে।

এ যেন "পঞ্চশরে দগ্ধ করে বিশ্বময়" ছড়াইয়া দেওয়ার মত। তাই ত বিরহিণীর ব্যথা এমন করিয়া নালিশ করে, নিজের অক্ষমতা জানায়—

সে থাকে নীল নভে আমি নয়ন-জল-সায়রে,
সাতাশ তারার সতীন সাথে সে যে ঘু'রে মরে,
কেমনে ধরি সে চাঁদে রাহু নহি।

কবি যাকে ভালবাসে, সে গোপন পায়ে বকুল ছায়ে যাতায়াত করে। সেই—

উষার রাগে সাঁঝের ফাগে
যুগল তাহার কপোল রাঙে
কমল দুলে সূরয্ শশী
নিশীথ চুলে আঁধার রাশে।

সূর্য্যকে প্রেয়সীর খোঁপার ফুল করিয়া গুঁজিয়া দেওয়া, কি-যে বিশ্বগ্রাসী তাই ভাবি। এই প্রেমিকই একদিন কহিয়াছিল—

সখি, মদনের বাণহানা শব্দ শুনিস,
ও যে বিষমাখা মিশকালো দোয়েলার শিষ।

সখি, তুমি বুঝি কান পাতিয়া মদনের বাণহানার শব্দ শুনিতেছ! ও ত বাণ নয়, ও যে কালো দোয়েলের শিষ সই, ও মদনের বাণহানা শব্দ নয়; সখি, তোমার ভুল, বন-মর্ম্মরে শ্রীপতির পদধ্বনি বলিয়া ধ্রুবের যেমন ভুল হইয়াছিল তেমনই ভুল।

উপরিউক্ত দুই লাইনের তুলনা বাংলাতে কেন, যে-কোন সাহিত্যেই হোক, অল্পই আছে—এ অতি দুঃসাহসিকের উক্তি হইতে পারে কিন্তু মিথ্যাবাদীর মিথ্যা ভাষণ নয় এ, তা জানি।

বুলবুল

কবে সে ফুল্‌কুমারী ঘোম্‌টা চিরি'
আস্‌বে বাহিরে,
শিশিরের্‌ স্পর্শসুখে ভাঙ্‌বে রে ঘুম
রাঙ্‌বে রে কপোল্‌ ॥

ফাগুনের মুকুল-জাগা দুকূল-ভাঙা
আস্‌বে ফুলেল্‌ বান,
কুঁড়িদের ওষ্ঠপুটে লুট্‌বে হাসি,
ফুট্‌বে গালে টোল্‌ ॥

কবি তুই গন্ধে ভু'লে ডুব্‌লি জলে
কূল পেলিনে আর,
ফুলে তোর বুক ভরেছিস্‌ আজ্‌কে জলে
ভর্‌বে আঁখির কোল ॥

জৌনপুরী-আশাবরী—কাহার্‌বা

আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী।
খু'লে দাও রং-মহলার তিমির-দুয়ার ডাকিলে যদি ॥

গোপনে চৈতী হাওয়ায় গুল্‌-বাগিচায় পাঠালে লিপি,
দেখে তাই ডাক্‌ছে ডালে কু কু ব'লে কোয়েল ননদী ॥

পাঠালে ঘূর্ণী-দূতী ঝড়-কপোতী বৈশাখে সখি,
বরষায় সেই ভরসায় মোর পানে চায় জল-ভরা নদী ॥

তোমারি অশ্রু ঝলে শিউলি-তলে সিক্ত শরতে,
হিমানীর পরশ বুলাও ঘুম ভেঙে দাও দ্বার যদি রোধি ॥

পউষের শূন্য মাঠে একলা বাটে চাও বিরহিনী,
দুহুঁ হায় চাই বিষাদে মধ্যে কাঁদে তৃষ্ণা-জলধি ॥

ভিড়ে যা ভোর্‌ বাতাসে ফুল্‌-সুবাসে রে ভোমর-কবি,
ঊষসীর শিশ্‌-মহলে আস্‌তে যদি চাস্‌ নিরবধি ॥

ইমন-মিশ্র গজল—কাহারবা

বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরণে চল লো গোরী।
চল জলে চল কাঁদে বনতল,
ডাকে ছলছল জল-লহরী॥

দিবা চ'লে যায় বলাকা-পাখায়,
বিহগের বুকে বিহগী লুকায়!
কেঁদে চখা চখী মাগিছে বিদায়
বারোয়াঁর সুরে ঝুরে বাঁশরী॥

সাঁজ হেরে মুখ চাঁদ-মুকুরে
ছায়াপথ-সিঁথি রচি' চিকুরে,
নাচে ছায়া-নটী কানন-পুরে,
দুলে লটপট লতা-কবরী॥

‘বেলা গেল বধূ’ ডাকে ননদী,
চ’লো জল নিতে যাবি লো যদি,
কালো হয়ে আসে সুদূর নদী,
নাগরিকা-সাজে সাজে নগরী॥

মাঝি বাঁধে তরী সিনান-ঘাটে,
ফিরিছে পথিক বিজন মাঠে,
কারে ভেবে বেলা কাঁদিয়া কাটে
ভর আঁখি-জলে ঘট গাগরী॥

ওগো বে-দরদী, ও রাঙা পায়ে
মালা হয়ে কে গো গেল জড়ায়ে।
তব সাথে কবি পড়িল দায়ে
পায়ে রাখি তারে না গলে পরি॥

পিলু—কাহার্‌বা-দাদ্‌রা

ভুলি কেমনে আজো যে মনে
বেদনা-সনে রহিল আঁকা।
আজো সজনী দিন রজনী
সে বিনে গণি তেমনি ফাঁকা ॥

আগে মন কর্‌লে চুরি
মর্ম্মে শেষে হান্‌লে ছুরি,
এত শঠতা এত যে ব্যথা
তবু যেন তা' মধুতে মাখা ॥

চকোরী দেখ্‌লে চাঁদে
দূর হ'তে সই আজো কাঁদে,
আজো বাদলে ঝুলন ঝোলে
তেমনি জলে চলে বলাকা ॥

বকুলের তলায় দোদুল্
কাজ্‌লা মেয়ে কুড়োয় লো ফুল,
চলে নাগরী কাঁখে গাগরী
চরণ ভারি কোমর বাঁকা ॥

তরুরা রিক্ত-পাতা
আস্‌ল লো তাই ফুল-বারতা,
ফুলেরা গ'লে ঝরেছে ব'লে
ভরেছে ফলে বিটপী-শাখা ॥

ডালে তোর হান্‌লে আঘাত
দিস্ রে কবি ফুল্-সওগাত,
ব্যথা-মুকুলে অলি না ছুঁলে
বনে কি দুলে ফুল-পতাকা ॥

মিশ্র বেহাগ-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

কেন কাঁদে পরাণ কী বেদনায় কারে কহি।
সদা কাঁপে ভীরু হিয়া রহি' রহি' ॥

সে থাকে নীল নভে আমি নয়ন-জল-সায়রে,
সাতাশ তারার সতীন-সাথে সে যে ঘু'রে মরে,
কেমনে ধরি সে চাঁদে রাহু নহি ॥

কাজল করি' যারে রাখি গো আঁখি-পাতে
স্বপনে যায় সে ধুয়ে গোপণ অশ্রু-সাথে।
বুকে তায় মালা করি' রাখিলে যায় সে চুরি,
বাঁধিলে বলয়-সাথে মলয়ায় যায় সে উড়ি',
কি দিয়ে সে উদাসীর মন মোহি' ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—কাহার্‌বা

মৃদুল্‌ বায়ে বকুল ছায়ে
গোপন পায়ে কে ঐ আসে।
আকাশ-ছাওয়া চোখের চাওয়া,
উতল্‌ হাওয়া কেশের বাসে॥

উষার রাগে সাঁঝের ফাগে
যুগল তাহার কপোল রাঙে,
কমল তুলে সূর্য্য্‌ শশী
নিশীথ-চুলে আঁধার রাশে॥

চরণ্‌-ছোঁওয়ায় পাতার ঠোঁটে
মুকুল কাঁপে কুসুম ফোটে,
আঁখির পলক- পতন-ছাঁদে
নিশীথ্‌ কাঁদে দিবস হাসে॥

গ্রহের মালা অলখ্‌-খোঁপায়,
কপোল শোভে তারার টোপায়,
কুসুম-কাঁটায় আঁচল বাধে
রুমাল লুটায় সবুজ ঘাসে ॥

সাঁঝের শাখায় কানন মাঝে
বালার বিহগ- কাঁকন বাজে,
জীবন তাহার সোনার স্বপন
দোলায় ঘুমায় শিশুর পাশে ॥

তোমার লীলা- কমল ক'রে
নিখিল-রাণী ! দুলাও মোরে।
দুলাও আমার সুবাস খানি
তোমার মুখের মদির শ্বাসে ॥

ভৈরবী-আশাবরী—কাহারবা

কে বিদেশী বন-উদাসী
বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে।
সুর্-সোহাগে তন্দ্রা লাগে
কুসুম-বাগের গুল্-বদনে॥

ঝিমিয়ে আসে ভোমোরা-পাখা,
যুঁথির চোখে আবেশ মাখা,
কাতর ঘুমে চাঁদিমা রাকা
(ভোর গগনের দর্-দালানে)
দর্-দালানে ভোর্ গগনে॥

লজ্জাবতীর লুলিত লতায়
শিহর লাগে পুলক-ব্যথায়,
মালিকা সম বঁধুরে জড়ায়
বালিকা-বধূ সুখ-স্বপনে॥

বুল্‌বুল্‌

সহসা জাগি'   আধেক রাতে
শুনি সে বাঁশী   বাজে হিয়াতে,
বাহু-সিথানে   কেন কে জানে
কাঁদে গো পিয়া   বাঁশীর সনে ॥

বৃথাই গাঁথি'   কথার মালা
লুকাস্‌ কবি   বুকের জ্বালা,
কাঁদে নিরালা   বন্‌শীওয়ালা
তোরি উতালা   বিরহী মনে ॥

সিন্ধু—কাওয়ালী

করুণ কেন অরুণ আঁখি
দাও গো সাকী দাও শারাব।
হায় সাকী এ আঙ্গুরী খুন,
নয় ও হিয়ার খুন-খারাব ॥

দুর্দ্দিনের এই দারুণ দিনে
শরণ নিলাম পান্-শালায়,
হায় সাহারার প্রখর তাপে
পরাণ কাঁপে দিল্ কাবাব ॥

আর সহেনা দিল্ নিয়ে এই
দিল্-দরদীর দিল্লগী,
তাই ত চালাই নীল পেয়ালায়
লাল শিরাজী বে-হিসাব ॥

এই শারাবের নেশার রঙে
নয়ন-জলের রঙ্ লুকাই,
দেখ্‌ছি আঁধার জীবন ভরি'
ভর্-পিয়ালার লাল খোয়াব্ ॥

আমার বুকের শূন্যে কে গো
ব্যথার তারে ছড়্ চালায়,
গাইছি খুশীর মহফিলে গান
বেদন্-গুণীর বীণ্ রবাব্ ।

হারাম কি এই রঙীন পানি,
আর হালাল এই জল চোখের ?
নরক আমার হউক মঞ্জুর,
বিদায়-বন্ধু, লও আদাব ॥

দেখ্ রে কবি, প্রিয়ার ছবি
এই শারাবের আর্শিতে,
লাল গেলাসের কাচ্-মহলার
পার হ'তে তার শোন জওয়াব ॥

মান্দ—কাওয়ালী

এত জল ও-কাজল-চোখে
পাষাণী, আন্‌লে বল কে।
টলমল জল্‌-মোতির মালা
দুলিছে ঝালর-পলকে ॥

দিল কি পূব্‌-হাওয়াতে দোল্‌,
বুকে কি বিঁধিল কেয়া ?
কাঁদিয়া কুটিলে গগন
এলায়ে ঝামর-অলকে ॥

চলিতে পৈঁচি কি হাতের
বাধিল বৈঁচি-কাঁটাতে ?
ছাড়াতে কাঁচুলির কাঁটা
বিঁধিল হিয়ার ফলকে ॥

যে দিনে মোর-দেওয়া-মালা
ছিঁড়িলে আন্‌মনে সখি,
জড়াল যুঁই-কুসুমী-হার
বেণীতে সেদিন ওলো কে ॥

যে-পথে নীর্‌ ভরণে যাও
ব'সে রই সেই পথ-পাশে,
দেখি, নিত্‌ কার পানে চাহি'
কলসীর সলিল ছলকে ॥

মুকুলী মন সেধে সেধে
কেবলি ফিরিনু কেঁদে,
সরসীর ঢেউ পলায় ছুটি'
না ছুঁতেই নলিন্‌—নোলকে ॥

বুকে তোর সাত সাগরের জল,
পিপাসা মিট্‌লনা কবি,
ফটিক-জল ! জল খুঁজিস যেথায়
কেবলি তড়িৎ ঝলকে ॥

ভীমপলশ্রী—দাদরা

আসে বসন্ত ফুলবনে
সাজে বনভূমি সুন্দরী।
চরণে পায়েলা রুমুঝুমু
মধুপ উঠিছে গুঞ্জরি' ॥

ফুলরেণু-মাখা দখিণা বায়
বাতাস করিছে বন-বালায়,
বন-কবরী-নিকুঞ্জ-ছায়
মুকুলিকা ওঠে মুঞ্জরি'

কুহু আজি ডাকে মুহুমুহু,
'পিউ কাহাঁ' কাঁদে উহু উহু,
পাখায় পাখায় দোঁহে ছুহুঁ
বাঁধে চঞ্চুর চঞ্চুরী ॥

বুলবুল

দুলে আলো ছায়া বন-দুকুল,
ওড়ে প্রজাপতি কল্‌কা ফুল,
কর্ণে অতসী স্বর্ণ-দুল,
আলোক-লতার সাত-নোরী ॥

পদ্ম ডলিয়া পায়ে বালা
করিয়াছে সারা বন আলা,
দ্বারে মঞ্জরী-দীপ জ্বালা,
ডাল্‌পালা রচে ফুলছড়ি ॥

কবি, তোর ফুলমালি কেমন,
ফাগুনে শূন্য পুষ্পবন,
বরিবি বঁধুরে এলে কানন
রিক্ত হাতে কি ভুল ভরি' ॥

কাফি-সিন্ধু—কাহারবা

দুরন্ত বায়ু পূরবইয়াঁ
বহে অধীর আনন্দে।
তরঙ্গে দুলে আজি নাইয়াঁ
রণ-তুরঙ্গ-ছন্দে॥

অশান্ত অম্বর-মাঝে
মৃদঙ্গ গুরুগুরু বাজে,
আতঙ্কে থরথর অঙ্গ
মন অনন্তে বন্দে॥

ভুজঙ্গী দামিনীর দাহে
দিগন্ত শিহরিয়া চাহে,
বিষণ্ণ ভয়-ভীতা যামিনী
খোঁজে সেতারা চন্দে॥

বুলবুল

মালঞ্চে এ কি ফুল-খেলা
আনন্দে ফোটে যুথী বেলা,
কুরঙ্গী নাচে শিখী-সঙ্গে
মাতি' কদম্ব-গন্ধে ॥

একান্তে তরুণী তমালী
অপাঙ্গে মাখে আজি কালি,
বনান্তে বাঁধা প'ল দেয়া
কেয়া-বেণীর বন্ধে ॥

দিনান্তে বসি' কবি একা
পড়িস্ কি জলধারা-লেখা,
হিয়ায় কি কাঁদে কুহু কেকা
আজি অশান্ত দ্বন্দ্বে ॥

বাগেশ্রী-পিলু—কাহারবা

চেয়োনা সুনয়না
আর চেয়োনা এ নয়ন পানে।
জানিতে নাইক বাকী
সই ও আঁখি কী যাদু জানে॥

একে ঐ চাউনি বাঁকা
সুর্ম্মা আঁকা, তায় ডাগর আঁখি
বধিতে তায় কেন সাধ
যে মরেছে ঐ আঁখি-বানে॥

কাননে হরিণ কাঁদে,
সলিল-ফাঁদে ঝুর্‌ছে শফরী,
বাঁকায়ে ভুরূর ধনু
ফুল-অতনু কুসুম-শর হানে॥

বুলবুল

কুনাল কি পড়্‌ল ধরা
পীযূষ-ভরা ঐ চাঁদো মুখে,
কাঁদিছে নার্গিসের ফুল
লাল কপোলের কমল-বাগানে ॥

জ্বলিছে দিবস রাতি
মোমের বাতি রূপের দেওয়ালী,
নিশিদিন তাই কি জ্বলি'
পড়্‌ছ গলি' অঝোর নয়ানে ॥

মিছে তুই কথার কাঁটায়
সুর বিঁধে হায় হার গাঁথিস কবি
বিকিয়ে যায় রে মালা
আয় নিরালা আঁখির দোকানে ॥

পিলু-দাদ্‌রা

পরাণ-প্রিয় ! কেন এলে অবেলায় ।
শীতল হিমেল বায়ে ফুল ঝ'রে যায় ॥

সেদিনো সকাল বেলা
খেলেছি কুসুম-খেলা,
আজি যে কাঁদি একেলা
এ ভাঙা মেলায়
কেন এলে অবেলায় ॥

ক্লান্ত দিবস দূরে
কাঁদিছে পিলুর সুরে,
কেন শত পথ ঘুরে
আসিলে হেথায় ॥

ভৈরবী—যৎ

সখি জাগো, রজনী পোহায়।
মলিন কামিনী-ফুল যামিনী-গলায়।।
চলিছে বধূ সিনানে
বসন না বশ মানে,
শিথিল আঁচল টানে
পথের কাঁটায়।।

ভৈরবী—কাহার্‌বা

নিশি ভোর হ'ল জাগিয়া
পরাণ পিয়া।
কাঁদে 'পিউ কাহাঁ' পাপিয়া
পরাণ পিয়া ॥

ভুলি' বুল্‌বুলি-সোহাগে
কত গুল্‌বদনী জাগে,
রাতি গুল্‌সনে যাপিয়া
পরাণ পিয়া ॥

জেগে রয় জাগার সাথী
দূরে চাঁদ, শিয়রে বাতি,
কাঁদি ফুল-শয়ন পাতিয়া,
পরাণ পিয়া।

কত আর সাজাব ডালা,
বাসি হয় নিতি যে মালা,
কত দূর যাব ভাসিয়া,
পরাণ পিয়া ॥

গেয়ে গান চেয়ে কাহারে
জেগে র'স কবি এপারে
দিলি দান কারে এ হিয়া,
পরাণ পিয়া ॥



বৃন্দাবনী সারঙ্ মিশ্র—দাদ্‌রা

এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো ছলিতে।
কেন পুনঃ বাঁশী বাজালে কাফি ললিতে॥
নিশীথ গভীরে
কেন আঁখি-নীরে
এলে ফিরে ফিরে
গোপন কথা বলিতে॥
দলিত কুসুম-দলে রচিয়াছি শয়ন
অন্ধ তিমির রাতি, নিবু-নিবু নয়ন!
মরণ-বেলায় প্রিয়
আনিলে কি অমিয়,
এলে কি গো নিঠুর
ঝরা ফুল দলিতে

কালাংড়া—কাওয়ালী

বসিয়া নদীকূলে এলোচুলে
কে উদাসিনী।
কে এলে পথ ভু'লে
এ অকূলে বন-হরিণী ॥

কলসে জল ভরিয়া চায়
করুণায় কুলবধূরা,
কেঁদে যায় ফু'লে ফু'লে
পদমূলে সাঁঝ-তটিনী ॥

নিশিদিন চাহি' তোমারে
ওপারে বাজিছে বাঁশী,
এপারে বাজে বধূর
মল-নূপুর মধু-ভাষিনী ॥

আকাশে মেলিয়া আঁখি
লেখা কি পড়িছ পিয়ার,
কে গো সে রূপ-কুমার
তুমি গো যার অনুরাগিণী ॥

দলিয়া কত ভাঙা মন
ও চরণ করেছ রাঙা,
কাঁদায়ে কত না দিল্‌
এলে নিখিল-মনোমোহিনী ॥

হারালি গোধূলি-লগন,
কবি, কোন্‌ নদী-কিনারে,
একি সেই স্বপন-চাঁদ
পেতেছে ফাঁদ প্রিয়ার সতিনী ॥

বেহাগ—দাদ্‌রা

কেন দিলে এ কাঁটা
যদি গো কুসুম দিলে
ফুটিতনা কি কমল
ও কাঁটা না বিঁধিলে ॥

কেন এ আঁখিকূলে
বিধুর অশ্রু দুলে,
কেন দিলে এ হৃদি
যদি না হৃদয় মিলে ॥

শীতল মেঘ-নীরে
ডাকিয়া চাতকীরে
নীর ঢালিতে শিরে
বাজ কেন হানিলে।

যদি ফুটালে মুকুল
কেন শুকাইলে ফুল,
কেন কলঙ্ক-টীপে
চাঁদের ভুরূ ভাঙিলে ॥

কেন কামনা-ফাঁদে
রূপ-পিপাসা কাঁদে,
শোভিতনা কি কপোল
ও কালো তিল নহিলে।

কাঁটা-নিকুঞ্জে কবি
এঁকে যা সুখের ছবি,
নিজে তুই গোপণ র'বি
তোরি আঁখির সলিলে ॥

বিহারী খাম্বাজ মিশ্র—দাদ্‌রা

সখি, ব'লো বঁধুয়ারে নিরজনে।
দেখা হ'লে রাতে ফুলবনে ॥
কে করে ফুল চুরি জেনেছে ফুলমালি,
কে দেয় গহীর রাতে ফুলের কুলে কালি
জেনেছে ফুলমালি গোপণে ॥

কাঁটার আড়ালে গোলাবের বাগে
ফুটায়েছে কুসুম কপট সোহাগে,
সে কুসুম ঘেরা মেহেদীর বেড়া,
প্রহরী ভোমোরা সে কাননে ॥

ও পথে চোর-কাঁটা, সখি, তায় ব'লে দিও,
বেঁধেনা বেঁধেনা লো যেন তার উত্তরীয়!
এ বনফুল লাগি' না আসে কাঁটা দলি'
আপনি যাব আমি বঁধুয়ার কুঞ্জ গলি'।
বিকাব বিনিমূলে ও চরণে ॥

দুর্গা কাওয়ালী

নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখি-জল।
মলিন হয়েছে ঘুমে চোখের কাজল॥

হেরিয়া নিশি প্রভাতে
শিশির কমল-পাতে,
ভাব বুঝি বেদনাতে
কেঁদেছে কমল॥

মরুতে চরণ ফেলে
কেন বন-মৃগ এলে,
সলিল চাহিতে পেলে
মরীচিকা-ছল॥

এ শুধু শীতের মেঘে
কপট কুয়াসা লেগে
ছলনা উঠেছে জেগে—
এ নহে বাদল ॥

কেন কবি খালি খালি
হলি রে চোখের বালি,
কাঁদাতে গিয়া কাঁদালি
নিজেরে কেবল ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী

এ আঁখি-জল মোছ পিয়া,
ভোলো ভোলো আমারে
মনে কে গো রাখে তারে
ঝরে যে ফুল আঁধারে ॥

ফোটা ফুলে ভরি' ডালা
গাঁথ বালা মালিকা,
দলিত এ ফুল লয়ে
দেবে গো বল কারে ॥

স্বপনের স্মৃতি প্রিয়
জাগরণে ভুলিও,
ভু'লে যেয়ো দিবালোকে
রাতের আলেয়ারে ॥

ঝুরিয়া গেল যে মেঘ
রাতে তব আঙিনায়,
বৃথা তারে খোঁজ প্রাতে
দূর গগন-পারে ॥

ঘুমায়েছ সুখে তুমি
সে কেঁদেছে জাগিয়া,
তুমি জাগিলে গো যবে
সে ঘুমায়ে ওপারে ॥

আগুনে মিটালি তৃষা
কবি কোন্ অভিমানে,
উদিল নীরদ যবে
দূর বন-কিনারে ॥

ভৈরবী—পোস্তা

কি হবে জানিয়া বল
কেন জল নয়নে।
তুমি ত ঘুমায়ে আছ
সুখে ফুল-শয়নে॥

তুমি কি বুঝিবে বালা
কুসুমে কীটের জ্বালা,
কারো গলে দোলে মালা
কেহ ঝরে পবনে॥

আকাশের আঁখি ভরি'
কে জানে কেমন করি'
শিশির পড়ে গো ঝরি'
ঝরে বারি শাওনে।

বুল্‌বুল

নিশীথে পাপিয়া পাখী
এমনি ত ওঠে ডাকি'
তেমনি ঝুরিছে আঁখি
বুঝি বা অকারণে ॥

কে শুধায়, আঁধার চরে
চখা কেন কেঁদে মরে,
এমনি চাতক-তরে
মেঘ ঝুরে গগনে।

কারে মন দিলি কবি,
এ যে রে পাষাণ-ছবি,
এ শুধু রূপের রবি
নিশীথের স্বপনে ॥

বিহারী—ঠুংরি

পরদেশী বঁধুয়া,
এলে কি এতদিনে।
আসিলে এতদিনে
কেমনে পথ চিনে॥

তোমারে খুঁজিয়া
কত রবি শশী
অন্ধ হইল প্রিয়,
নিভিল তিমিরে,

তব আশে আকাশ
তারা-দীপ জ্বালি'
জাগিয়াছে নিশি
ঝুরিয়া শিশিরে!

শুকায়েছে স্বরগ,
দেবতা, তোমা বিনে ॥

কত জনম ধরি'
ছিলে বল পাশরি'
এতদিনে বাঁশরী
বাজিল কি বিপিনে ॥

নিতি ফুল-সনে
ফুটিয়া কাননে
ঝরিয়াছি সাঁঝে
নিরাশ হুতাশে,
নব নব গানে
বেদনা নিবেদন
করিয়াছে কবি,
প্রিয়, তব পাশে !
এলে আজি উদাসী
নিখিল-মন জিনে ॥

বেহাগ-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

কেন উচাটন মন
পরাণ এমন করে।
কেন কাঁদে গো বধূ
বঁধুর বুকে বাসরে॥

কেন মিলন-রাতে
সলিল আঁখি-পাতে,
কেন ফাগুন-প্রাতে
সহসা বাদল ঝরে॥

ডাকিলে অনুরাগে
কেন বিদায় মাগে,
(কেন) মরিতে সাধ জাগে
পিয়ার বুকের পরে॥

বুলবুল

ডাকিয়া ফুলবনে
থাকে সে আনমনে,
কাঁদায়ে নিরজনে
কাঁদে সে কিসের তরে ॥

কবি, তোরে কে কবে
সাধিল বেণুর রবে,
ধরিতে গেলি যবে
বিঁধিল কুসুম-শরে ॥

পিলু-ভৈরবী—কাহার্‌বা

আসিলে এ ভাঙা ঘরে
কে মোর রাঙা অতিথি
হরষে বরিষে বারি
শাওন-গগন তিতি' ॥

বকুল-বনের সাকী
নটীন্‌ পূবালী হাওয়া
বিলায় সুরভি-সুরা,
মাতায় কানন-বীথি ॥

বনের বেশর গাঁথে
কদম-কেশর ঝুরি'
শিশির-চূণীর হারে
উজল উশীর-সিঁথি ॥

তিতির শিখীর সাথে
নোটন-কপোতী নাচে,
ঝিঁঝির ঝিয়ারী গাহে
ঝুমুর কাজরী-গীতি ॥

হিঙুল হিজল-তলে
ডাহুক পিছল-আঁখি,
বধূর তমাল চোখে
ঘনায় নিশীথ-ভীতি

তিমির-ময়ূর আজি
তারার পেখম খোলে,
জড়ায় গগন-গলে
চাঁদের ষোড়শী তিথি ॥

মিলন-মালায় বাজে
গোপণ মৃণাল-কাঁটা,
নয়ন-জলে কি কবি
আঁকিস্ তাহারি স্মৃতি ॥

কালাংড়া-বসন্ত-হিন্দোল—দাদরা

আজি দোল-পূর্ণিমাতে   দুল্‌বি তোরা আয়।
দখিণার দোল্ লেগেছে   দোলন্‌-চাঁপায় ॥
দোলে আজ দোল্‌-ফাগুনে
ফুল-বান আঁখির তূণে,
দুলে আজ বিধুর হিয়া মধুর ব্যথায় ॥

দুলে আজ শিথিল বেণী, দুলে বধূর মেখলা,
দুলে গো মালার পলা জড়াতে বঁধূর গলা।
মাধবীর দোলন্‌-লতায়
দোয়েলা দোল্ খেয়ে যায়,
দুলে যায় হল্‌'দে পাখী   সোঁদাল্‌-শাখায় ॥

বিরহ-শীর্ণা নদীর আজিকে আঁখির কূলে
ভরে জল কানায় কানায় জোয়ারে উঠ্‌ল দু'লে।
দুলে বসন্ত-রাণী
কুসুমিতা বনানী,
পলাশ রঙন দোলে নোটন-খোঁপায়॥

দোলে হিন্দোল-দোলায় ধরণী শ্যাম-পিয়ারী,
দুলিছে গ্রহ তারা আলোক-গোপ-ঝিয়ারী।
নীলিমার কোলে বসি'
দুলে কলঙ্কী-শশী,
দোলে ফুল-উর্ব্বশী ফুল-দোলনায়॥



পিলু—দাদ্‌রা

রুমুঝুমু রুমুঝুম্‌
কে এলে নূপুর-পায় ।
ফুটিল শাখে মুকুল
ও রাঙা চরণ-ঘায় ॥

সে নাচে তটিনী-জল
টলমল টলমল,
বনের বেণী উতল
ফুলদল মুরঝায় ॥

বিজরী জরীর আঁচল
ঝলমল ঝলমল,
নামিল নভে বাদল
ছলছল বেদনায় ॥

দুলিছে মেখলা-হার
　　　শ্যামলী মেঘমালার,
উড়িছে অলক কা'র
　　　অলকার ঝরোকায়।

তালীবন থৈ তাথৈ
　　　করতালি হানে ঐ
কবি, তোর তমালী কই—
　　　শ্বসিছে পূবালী-বায়॥

সিন্ধু কাফি-খাম্বাজ—যৎ

আজি এ কুসুম-হার সহি কেমনে।
ঝরিল যে ধুলায় চির-অবহেলায়
কেন এ অবেলায় পড়ে তারে মনে॥

তব তরে মালা গেঁথেছি নিরালা
সে ভরেছে ডালা নিতি নব ফুলে।
(আজি) তুমি এলে যবে বিপুল গরবে
সে শুধু নীরবে মিশাইল বনে॥

আঁখি-জলে ভাসি' গাহিত উদাসী
আমি শুধু হাসি' আসিয়াছি ফিরে।
(আজি) সুখ-মধুমাসে তুমি যবে পাশে
সে কেন গো আসে কাঁদাতে স্বপনে॥

কার সুখ লাগি' রে কবি বিবাগী,
সকল তেয়াগি' সাজিলি ভিখারী ।
(তুই) কার আঁখি-জলে বেঁচে রবি ব'লে
ফুলমালা দ'লে লুকালি গহনে ॥

মালকোষ—গীতঙ্গী

গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু।
নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভু ॥

সে-নাচ-হিল্লোলে জটা-আবর্ত্তনে
সাগর ছুটে আসে গগন-প্রাঙ্গনে।
আকাশে শূল হানি
শোনাও নব বাণী,
তরাসে কাঁপে প্রাণী
প্রসীদ শম্ভু ॥

ললাট-শশী টলি জটায় পড়ে ঢলি,
সে-শশী-চমকে গো বিজুলি ওঠে ঝলি।

ঝাঁপে নীলাঞ্চলে মুখ দিগঙ্গনা,
মূরছে ভয়-ভীতা নিশি নিরঞ্জনা।
আঁধারে পথ-হারা
চাতকী কেঁদে সারা,
যাচিছে বারিধারা
ধরা নিরম্বু ॥

ছায়ানট—কাওয়ালী

হাজার তারার হার হ'য়ে গো
দুলি আকাশ-বীণার গলে।
তমাল-ডালে ঝুলন ঝুলাই
নাচাই শিখী কদম-তলে॥

'বৌ কথা কও' ব'লে পাখী
করে যখন ডাকাডাকি,
ব্যথার বুকে চরণ রাখি
নামি বধূর নয়ন-জলে॥

ভয়ঙ্করের কঠিন আঁখি
আঁখির জলে করুণ করি,
নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' চলি
আকাশ-বধূর নীলাম্বরী।

লুটাই নদীর বালুতটে,
সাধ ক'রে যাই বধূর ঘটে,
সিনান-ঘাটের শিলা-পটে
ঝরি চরণ-ছোঁওয়ার ছলে ।।

হাম্বীর—কাওয়ালী

অধীর অম্বরে গুরু গরজন মৃদঙ্‌ বাজে।
রুমু্ রুমু্ ঝুম্ মঞ্জীর-মালা চরণে আজ উতলা যে ॥

এলোচুলে দু'লে দু'লে বন-পথে চল আলি
মরা গাঙে বালুচরে কাঁদে যথা বন্-মরালী।
উগারি' গাগরি ঝারি
দে লো দে করুণা ডারি,
ঘুঙট উতারি' বারি
ছিটা লো গুমোট সাঁঝে ॥

তালীবন হানে তালি, ময়ূরী ইশারা হানে,
আসন পেতেছে ধরা মাঠে মাঠে চারা-ধানে

মুকুলে ঝরিয়া পড়ি আকুতি জানায় যূথী,
ডাকিছে বিরস শাখে তাপিতা চন্দনা তূতী।
কাজল-আঁখি রসিলি
চাহে খুলি ঝিলিমিলি,
চল লো চল সেহেলী
নিয়ে মেঘ-নটরাজে ॥

দেশ-সুরট—একতালা

ঝরে ঝরঝর কোন্ গভীর গোপন ধারা এ শাওনে।
আজি রহিয়া রহিয়া গুমরায় হিয়া একা এ আগুনে॥

ঘনিমা ঘনায় ঝাউ-বীথিকায় বেনু-বন-ছায় রে,
ডাহুকীরে খুঁজি ডাহুক কাঁদে আঁধার গহনে॥

কেয়া-বনে দেয়া তূণীর বাঁধিয়া
গগনে গগনে ফেরে গো কাঁদিয়া।
বেতস-বিতানে নীপ-তরুতলে
শিখী নাচ ভোলে পুছ-পাখা টলে।

মালতী-লতায় এলাইয়া বেণী কাঁদে বিষাদিনী রে,
কাজল-আঁখি কে নয়ন মোছে তমাল-কাননে॥

জয়জয়ন্তী—একতালা

হৃদয় যত নিষেধ হানে নয়ন ততই কাঁদে।
দূরে যত পলাতে চাই নিকট ততই বাঁধে॥

স্বপন-শেষে বিদায়-বেলায়
অলক কাহার জড়ায় গো পায়,
বিধুর কপোল স্মরণ আনায়
ভোরের করুণ চাঁদে।

বাহির আমার পিছল হ'ল কাহার চোখের জলে
স্মরণ ততই বারণ জানায় চরণ যত চলে।

পার হতে চাই মরণ-নদী
দাঁড়ায় কে গো দুয়ার রোধি,
আমায় ওগো বে-দরদী
ফেলিলে কোন ফাঁদে॥

কালাংড়া-ভৈরোঁ—আদ্ধা কাওয়ালী

শুকাল মিলন-মালা আমি তবে যাই।
কি যেন এ নদী-কূলে খুঁজিনু বৃথাই ॥

রহিল আমার ব্যথা
দলিত কুসুমে গাঁথা,
ঝু'রে বলে ঝরা পাতা—
নাই কেহ নাই ॥

যে-বিরহে গ্রহতারা সৃজিল আলোক,
সে-বিরহে এ-জীবন জ্বলি' পুণ্য হোক্।

চক্রবাক চক্রবাকী
করে যেমন ডাকাডাকি.
তেমনি এ-কূলে থাকি
ও-কূলে তাকাই ॥

দর্‌বারি কানাড়া—যৎ

স্মরণ-পারের ওগো প্রিয়, তোমায় আমি চিনি যেন।
তোমার চাঁদে চিনি আমি, তুমি আমার তারায় চেন ॥

নতুন পরিচয়ের লাগি
তারায় তারায় থাকি জাগি,
বারে বারে মিলন মাগি
বারে বারে হারাই হেন ॥

নতুন চোখের প্রদীপ জ্বালি চেয়ে আছি নিরিবিলি,
খোলো প্রিয় তোমার ধরার বাতায়নের ঝিলি-মিলি।

নিবাও নিবু-নিবু বাতি,
ডাকে নতুন তারার সাথী,
ওগো আমার দিবস রাতি
কাঁদে বিদায়-কাঁদন কেন ॥

পিলু—কাহার্‌বা

গহীন রাতে
ঘুম কে এলে ভাঙাতে।
ফুল-হার পরায়ে গলে
দিলে জল নয়ন-পাতে ॥

যে জ্বালা পেনু জীবনে
ভুলেছি রাতে স্বপনে,
কে তুমি এসে গোপনে
ছুঁইলে সে বেদনাতে ॥

যবে কেঁদেছি একাকী
কেন মুছালেনা আঁখি,
নিশি আর নাহি বাকী
বাসি ফুল ঝরিবে প্রাতে ॥

কেন এ কুহেলি ঠেলে
দখিনা বাতাস এলে,
কবি তুই হৃদয় মেলে
ছিলি কি এরি আশাতে ॥

সিন্ধু—কাওয়ালী

কোন্ শরতে পূর্ণিমা-চাঁদ আসিলে এ ধরাতল।
কে মথিল তব তরে কোন্ সে ব্যথার সিন্ধু-জল॥

দুয়ার-ভাঙা জাগ্‌ল জোয়ার বেদনার ঐ দরিয়ায়।
আজ ভারতী অশ্রুমতী মধ্যে দুলে টলমল॥

কখন্ তোমার বাজ্‌ল বেণু প্রাণের বংশী-বট-ছায়।
মরা গাঙের ভাঙা ঘাটে ঘট ভরে গোপিনী দল॥

বিদ্যুতের বাঁকা হাসি হাসিয়া কালো মেঘে,
আসিলে কে অভিমানী বহায়ে মরুতে ঢল॥

লয়ে হাতে জিয়ন-কাঠি আসিলে কে রূপ-কুমার
উঠ্‌ল জেগে রূপ-কুমারী আঁধারে ঐ ঝলমল॥

আকাশে চকোরী কাঁদে, তড়াগে চাহে কুমুদ,
ঝরুক আঁখির শেফালিকা ছুঁয়ে তব পদতল॥

ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা

জাগিলে "পারুল" কিগো "সাত ভাই চম্পা" ডাকে
উদিলে চন্দ্র-লেখা বাদলের মেঘের ফাঁকে ॥

চলিলে সাগর ঘু'রে
অলকার মায়ার পুরে,
ফোটে ফুল নিত্য যথায়
জীবনের ফুল্ল-শাখে ॥

আঁধারের বাতায়নে চাহে সাজ লক্ষ তারা,
জাগিছে বন্দিনীরা, টুটে ঐ বন্ধ কারা।

থেকোনা স্বর্গে ভু'লে
এ পারের মর্ত্ত্য কূলে,
ভিড়ায়ো সোনার তরী
আবার এই নদীর বাঁকে।

খাম্বাজ—আড়-খেম্‌টা

চরণ ফেলি গো মরণ-ছন্দে
মথিয়া চলি গো প্রাণ।
মর্ত্ত্যের মাটী মহীয়ান করি
স্বর্গেরে করি' ম্লান॥

চিতার বিভূতি মাখিয়া গায়
লজ্জা হানি গো অন্নদায়,
বাঁধিয়াছি বজ্রবল্লতায়,
দেবরাজ হতভান।

পাতাল ফুঁড়িয়া করি গো মাতাল
রসাতল-অভিযান॥

বৃন্দাবনী সারং—ঝাঁপতাল

নমো হে নমো যন্ত্রপতি নমো নমো অশান্ত।
তন্ত্রে তব ত্রস্ত ধরা, সৃষ্টি পথভ্রান্ত ॥

বিশ্ব হ'ল বস্তুময়
মন্ত্রে তব হে.
নন্দন-আনন্দে তুমি
গ্রাসিলে মহাধ্বান্ত ॥

শঙ্কর হে, সে কোন্ সতী-শোকে হ'য়ে নৃশংস.
বসেছ ধ্যানে হয়েছ জড় সাধিতেছ এ ধ্বংস।

রুক্ষ তব দৃষ্টি-দাহে
শুষ্ক সব হে,
ভীষণ তব চক্রাঘাতে
নির্জ্জিত যুগান্ত ॥

ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা

পূরবের তরুণ অরুণ
পূরবে আস্‌লে ফিরে।
কাঁদায়ে মহাশ্বেতায়
হিমানীর শৈল-শিরে॥

কুহেলির পর্দ্দা ডারি'
ঘুমাত রূপ-কুমারী,
জাগালে স্বপনচারী
তাহারে নয়ন-নীরে॥

তোমার ঐ তরুণ গলার
শুনি গান সিন্ধু-পারে,
তুলিছ মধ্যমণি
সুরমার কণ্ঠ-হারে।
খেয়ালী দিলে ধরা,
হ'ল সুর স্বয়ম্বরা,
এলে কি পাগল-ঝোরা
পাষাণের বক্ষ চিরে॥

দেশ—গীতঙ্গী

কে শিব-সুন্দর শরত-চাঁদ-চূড়
দাঁড়ালে আসিয়া এ অঙ্গনে।
পীড়িত নর-নারী আসিল গেহ ছাড়ি'
ভরিল নভতল ক্রন্দনে ॥

বেদনা-মন্দিরে আরতী বাজে তব,
কে তুমি সুন্দর শ্মশান-চারী নব,
দিগদিগন্তরে জীবন-উৎসব-
শঙ্খ শুনি তব আগমনে ॥

মৃত্যু-জয়ী তুমি হওনি সুধা পিয়ে,
দুখেরে দহিয়াছ বিষের দাহ দিয়ে।
ভূষণ করি' ফণী আদরে দিয়ে দোলা
কি মণি পেলে বল ওগো ও চির-ভোলা!

কভু সে ডম্বরু বাজাও অম্বরে,
প্রলয়-নর্ত্তন জাগে চরাচরে,
ললাট-জ্বালা-পাশে
চন্দ্র-লেখা হাসে
নবীন সৃষ্টির হরষণে ॥

পতিতা গঙ্গারে ধরিলে নিজ শিরে,
কন্যারূপে তাই পেলে কি ভারতীরে,
স্বরগ এল নেমে মরতে তব প্রেমে,
নমামি দেব-দেব ও-চরণে ॥

নূতন গান

গারা-ভৈরবী—কাহার্‌বা

কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে
আস্‌লে প্রাতে পুষ্পচোর।
ডাক্‌ছে পাখী, বৌ গো জাগো,
আর ঘুমায়না, রাত্রি ভোর॥

যুঁই-কুঁড়িরা চোখ মেলে চায়,
চুম্‌কুড়ি দেয় মৌমাছি।
শাপ্‌লা-বনে চাঁদ ডুবে যায়
ম্লান চোখে হায় চায় চকোর॥

ঘোম্‌টা ঠেলি' কয় চামেলি,
গোল ক'রোনা গুল্‌-ডাকাত,
ঢুলছে নয়ন, তুল্‌ছে গলায়
বেল টগরের ছিন্ন ডোর॥

বোর্‌কা খুলি' বন্‌-কেতকীর
　　　　ফুলরেণুতে রাঙ্‌লে গা,
পারুল-বধূর মাগ্‌লে মধু,
　　　　হাস্‌নাহেনার ভাঙ্‌লে দোর ॥

গায় কাওয়ালী বাদ্‌লি রুম্‌ঝুম্‌,
　　　　তয়্‌ কাওয়ালী নাচে মউর,
ঝুর্‌ছে কদম, মেখ্‌-তমালে
　　　　বিজ্‌লি-চোখে চায় কিশোর ॥

শোন্‌ রে কবি পুষ্পলোভী
　　　　আজ ধরেছি ফুল চুরি,
হুল ফুটিয়ে, ফুলবালাদের
　　　　কুল ভুলানো ভাঙ্‌ব তোর ॥

ভীমপলশ্রী—কাহার্‌বা

কেন আন ফুল-ডোর
আজি বিদায়-বেলা।
মোছ মোছ আঁখি-লোর
যদি ভাঙিল মেলা॥

কেন মেঘের স্বপন
আন মরুর চোখে,
ভুলে দিয়োনা কুসুম
যারে দিয়েছ হেলা॥

আছে বাহুর বাঁধন
তব শয়ন-সাথী,
আমি এসেছি একা
আমি চলি একেলা॥

বুলবুল

যবে শুকাল কানন
এলে বিধুর পাখী,
লয়ে কাঁটা-ভরা প্রাণ
এ কি নিঠুর খেলা ॥

যদি আকাশ-কুসুম
পেলি চকিতে কবি,
চল চল মুসাফির,
ডাকে পারের ভেলা ॥

(রাতের) দুর্গা—আদ্ধা কাওয়ালী

কেমনে রাখি
আঁখি-বারি চাপিয়া।
প্রাতে কোকিল কাঁদে,
নিশীথে পাপিয়া॥

এ ভরা ভাদরে
আমার মরা নদী
উথলি উথলি
উঠিছে নিরবধি।

আমার এ ভাঙা ঘটে
আমার এ হৃদিতটে
চাপিতে গেলে ওঠে
দু'কূল ছাপিয়া॥

নিষেধ নাহি মানে
আমার পোড়া আঁখি
জল লুকাব কত
কাজল মাখি' মাখি'।

ছলনা ক'রে হাসি
অমনি জলে ভাসি,
ছলিতে গিয়া আসি
ভয়েতে কাঁপিয়া ॥

গাঁথিতে ফুলমালা
বিঁধে সে কাঁটা হয়ে,
কাঁটার হার গাঁথি—
সে আসে ফুল লয়ে।

কবি রে জলধি এ
তাহারে মন দিয়ে
গেলি রে জল নিয়ে
জীবন ব্যাপিয়া ॥

(দিনের) দুর্গা—আদ্ধা কাওয়ালী

কেন আসিলে   যদি যাবে চলি।
গাঁথিলেনা মালা   ছিঁড়ে ফুল-কলি ॥

কেন বারেবারে   আসিয়া দুয়ারে
ফিরে গেলে পারে   কথা নাহি বলি ॥

কি কথা বলিতে   আসিয়া নিশীথে
শুধু ব্যথা-গীতে   গেলে মোরে ছলি ॥

প্রভাতের বায়ে   কুসুম ফুটায়ে
নিশীথে লুকায়ে   উড়ে গেল অলি ॥

কবি শুধু জানে,   কোন্ অভিমানে
চাহি যারে গানে   কেন তারে দলি ॥

যোগিয়া—ঝাঁপতাল

সাজিয়াছ যোগী বল কার লাগি'
তরুণ বিবাগী ॥
হের তব পায়ে
কাঁদিছে লুটায়ে
নিখিলের পিয়া
তব প্রেম মাগি'
তরুণ বিবাগী ॥
ফাল্গুন কাঁদে
দুয়ারে বিষাদে
খোলো দ্বার খোলো !
যোগী, যোগ ভোলো !
এত গীত হাসি
সব আজি বাসি,
উদাসী গো জাগো !
নব অনুরাগে
জাগো অনুরাগী
তরুণ বিবাগী ॥

বারোয়াঁ—কাহারবা

মুসাফির ! মোছ্ এ আঁখি-জল
ফিরে চল্ আপ্‌নারে নিয়া ।
আপনি ফুটেছিল ফুল
গিয়াছে আপ্‌নি ঝরিয়া ॥

রে পাগল ! এ কি দুরাশা,
জলে তুই বাঁধিবি বাসা !
মেটেনা হেথায় পিয়াসা
হেথা নাই তৃষ্ণা-দরিয়া ॥
বরষায় ফুট্‌লনা বকুল
পউষে ফুট্‌বে কি সে ফুল,
এ দেশে ঝরে শুধু ভুল
নিরাশার কানন ভরিয়া ॥
রে কবি, কতই দেয়ালি
জ্বালিলি তোর আলো জ্বালি',
এলনা তোর বনমালি
আঁধার আজ তোরই দুনিয়া ॥

মান্দ্‌—কাহার্‌বা

এ নহে বিলাস বন্ধু, ফুটেছি জলে কমল।
এ যে ব্যথা-রাঙা হৃদয় আঁখি-জলে টলমল ॥

কোমল মৃণাল-দেহ ভরেছে কণ্টক-ঘায়
শরণ লয়েছি গো তাই শীতল দীঘির জল ॥

ডুবেছি এ কালো নীরে কত যে জ্বালা সয়ে,
শত ব্যথা ক্ষত লয়ে হইয়াছি শতদল ॥

আমার বুকের কাঁদন তুমি বল ফুল-বাস,
ফিরে যাও, ফেলো না গো শ্বাস
দখিনা বায়ু চপল ॥

ফোটে যে কোন্‌ ক্ষত-মুখে
কবি রে তোর গীতসুর,
সে ক্ষত দেখিলনা কেউ,
দেখিল তোরে কেবল ॥

—সমাপ্ত—